রিভার্স মেটামরফোসিস - নব্য দেওবন্দি চিন্তাধারা

সাজ্জাদ জহির

মেটামরফোসিস প্রক্রিয়ায় শুয়োপোকা সময়ের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু প্রজাপতির মতো সুন্দর প্রাণী যদি শুয়োপোকায় রুপান্তরিত হয় তা কেমন হবে!? নিশ্চয়ই তা হবে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা! আর একে রূপান্তর না বলে বিকৃতি বলাই যুক্তিসংগত।

কোনো কিছুর পরিবর্তন মানেই সেটা উন্নতির ইঙ্গিত বহন করে, এমন নয়।

এখন, শতাব্দীব্যাপী ইসলাম, মুসলিম ও মানবজাতির হেফাজতকারীরা যদি পশ্চিমাদের রীতিনীতিই আঁকড়ে ধরে, তবে সেটা কেমন হবে!? আরো একটু ভাবুন—আপোষহীন দাওয়াহ, ইস্তিকামাত, ইদাদ, সামরিকায়ন ও আল ওয়ালা ওয়াল বারাআর দীক্ষাদাতারাই যদি পশ্চিমা ভাবাদর্শ, আলোচনার টেবিল, আর কুফফারদের সাথে হৃদ্যতার মানহাজ আঁকড়ে ধরেন, তা কেমন হবে!?

যদি এমন হয়েই থাকে, তাহলে বলতেই হয়, ইসলামের আলেম ও নেতাদের এই রিভার্স মেটামরফোসিস আমাদের জন্য প্রজাপতির শুয়োপোকাতে পরিণত হওয়ার চেয়ে অধিক দুঃখজনক ও বিব্রতকর!! তাই উপমহাদেশের নেককার মুসলিম নেতা ও উলামায়ে কেরাম কিভাবে নববি মানহাজ থেকে গণতন্ত্রের বিবর্তন ঘটালেন, তার নির্মোহ বিশ্লেষণ সময়ের দাবি।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সেক্যুলার মুসলিম লীগ শরীয়াহ শাসিত ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন করেনি। বরং উপমহাদেশের একটি নির্দিষ্ট অংশে পশ্চিমা আদর্শের সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন ছিল তাদের উদ্দেশ্য। অপরদিকে ছিল হিন্দুত্ববাদী শক্তির অধীন কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বকারী সেক্যুলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ। তারা হিন্দু শাসনের অধীনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন বা প্রাদেশিক প্রধান হওয়াকেই লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছিল। সেসময় থেকেই কংগ্রেসের অখন্ড ভারত আন্দোলনের পক্ষে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর চিন্তাধারা আজও হিন্দুস্থানের মুসলিমদের মাঝে ব্যাপকভাবে চর্চিত ও অনুসৃত। এ চিন্তাধারার অন্যতম নেতারা হচ্ছেন, কিফায়াতুল্লাহ দেহলবি (রহ.), সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহ.) প্রমুখ।

আর মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)-এর মুসলিম লীগের অধীনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার চিন্তাধারা দিয়ে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের সিংহভাগ উলামায়ে কেরাম এবং তাদের অনুসারীরা আজও প্রভাবিত। এ চিন্তাধারার অগ্রজদের মাঝে রয়েছেন, শাব্বির আহমাদ উসমানি (রহ.), মুফতি শফি (রহ.) প্রমুখ।

শাহ আব্দুল আজিজ ও সাইয়িদ আহমাদ শহিদদের সুযোগ্য উত্তরসূরীদের নেতৃত্বে ১৮৫৭-তে ব্রিটিশবিরোধী সর্বব্যাপী বিপ্লব ঘটে। এরপর হিন্দুদের উস্কানি ও ব্রিটিশদের চাপের মুখে উলামায়ে কেরাম ও মুসলিমদের জন্য এক নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ব্যাপক জুলুম ও অত্যাচারের ফলে অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়। পুনরায় শক্তি সঞ্চয় এবং ফিকরী ও আসকারী ইদাদের লক্ষ্যে মুজাহিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি (রহ.)-এর আস্থাভাজন কাসিম নানূতভি (রহ.) ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন দারুল উলুম দেওবন্দ। কাসিম নানূতভী (রহ.), রশিদ আহমাদ গাংগুহী (রহ.) ও শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (রহ.) সালাফদের মানহাজের আলোকে ইলম, দাওয়াহ, ইস্তেকামাত ও সামরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইসলামি শরীয়াহ ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। ভারতবর্ষের পাশে অবস্থিত আফগানিস্তান ও তুরস্কের মুসলিম শাসকগোষ্ঠীকে সামরিক অভিযানের আহ্বান জানানো এবং তাদের সাথে সমন্বয় করে ব্রিটিশরাজের পতন ঘটানোই ছিল শায়খুল হিন্দ এবং তাঁর সাথীদের পরিকল্পনা।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে অত্যাচারী শাসকদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে একই রকম কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সফলতা লাভ করেছিলেন

মিশর ও সিরিয়ায় মুসলিম নেতা ও আলেমগণ। যারা উসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় সেলিমের সাথে যোগাযোগ করেন এবং উসমানীদের মিশরে প্রবেশের পর সহযোগিতার মাধ্যমে অত্যাচারী মামলূক শাসনের অবসান ঘটাতে কার্যকর ভূমিকা রাখেন।

একইভাবে ক্রুসেডারদের প্রতিহত করতে আন্দালুসের নেতাদের দ্বারা ইউসুফ বিন তাশফিন (রহ.)-এর সাহায্য গ্রহণের ইতিহাসও অজানা নয়। শায়খুল হিন্দ (রহ.) একই পন্থায় সফলতার ও কল্যাণের সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

কিন্তু এক পর্যায়ে উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহ.) ব্রিটিশদের হাতে গ্রেফতার হয়ে যান এবং পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। এই আন্দোলনের নেতা শায়খুল হিন্দ (রাহিঃ) ও অন্যান্যদের গ্রেফতারপূর্বক মাল্টায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। ১৯১৪ সালে ব্যর্থ হওয়া এই মহান পদক্ষেপটি 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' নামে খ্যাত।

ইউরোপে খ্রিস্টধর্মের কর্তৃত্ব প্রতিস্থাপিত হয় প্রবৃত্তিপ্রসূত সেক্যুলারিজম দ্বারা। অর্থাৎ, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে মানুষের উদ্ভাবিত আইন-কানুন দ্বারা। শাসক নির্বাচন, পলিসি এবং সকলপ্রকার মতপার্থক্যের অবসান ঘটবে মানবীয় বুদ্ধির আলোকে। ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্মের থাকবে না কোনো স্থান। ইউরোপে খ্রিস্টানদের জুলুম ও সীমালঙ্ঘন এই আত্মঘাতী সেক্যুলারিজমের আবির্ভাবকে অনিবার্য করে তুলেছিল। কেননা মানুষ নিজ খ্রিস্টীয় অতীতের উপর হয়ে ওঠেছিল ত্যাক্ত-বিরক্ত!

কিন্তু, ভারতের মতো ভূমিতে কিভাবে সেক্যুলারিজম ও জাতীয়তাবাদী ধারণা জেঁকে বসলো!? এই ভূমির হিন্দু-মুসলিম সবাই জবরদখলকারী 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' নামক জাতিরাষ্ট্র ও 'সাম্রাজ্যবাদী সেক্যুলার আইনসভা'কে জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের কেন্দ্র মনে করত। তারা কিভাবে সেক্যুলারিজম ও ব্রিটিশ আইনসভাকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলো?! যে ভূমির মানুষজন ব্রিটিশপূর্ব ভারতের ইসলামি সমাজকে ন্যায় ও ইনসাফের যুগ সাব্যস্ত করত, তারা কেন পশ্চিমাদের অন্ধ তাকলিদের রাস্তা বেছে নিল!?

কারণ হচ্ছে, ভারতীয় মুসলিমদের নেতৃত্বের আসনগ্রহীতাদের কেউ (আলিগড়ি সেক্যুলার) সচেতনভাবে, আবার কেউ অচেতন বা অবচেতনভাবেই (দেওবন্দি উলামাগণ) ইসলামের বিরুদ্ধে চরম আগ্রাসন হিসেবে পশ্চিম থেকে আগত আধুনিকতাবাদ বা লিবারেলিজম নামক দ্বীনের মূলনীতিগুলো মেনে নিয়েছিলেন।

যার দরুণ উপমহাদেশে ব্যক্তি থেকে সমাজের সর্বস্তরে ইসলাম হয় নির্বাসিত। প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিমা সেক্যুলার দর্শন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ১৮৫৭-এর শামেলীর বিপ্লবী মুজাহিদ্বীনদের উত্তরসূরিদের অনেকেই ব্রিটিশ-প্রভাবিত শিবিরের কিভাবে যোগ দিলেন?

শুধু যোগ দিয়েই তারা ক্ষান্ত হলেন না; বরং হিন্দু নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস এবং সেক্যুলার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের আন্দোলনকে ফতোয়া, বক্তব্য, লেখালেখি এবং সাংগঠনিক সম্পৃক্তির মাধ্যমে বেগবান করে রাজনৈতিক আত্মহত্যার দিকে উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলিমদের ঠেলে দিলেন।

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদেরকে কংগ্রেসের মানহাজের অনুসারী মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ)-এর চিন্তাধারার ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও পর্যালোচনা প্রয়োজন। এ আলোচনা এখনো প্রাসঙ্গিক।

কেননা এই চিন্তাধারা আজও হিন্দুশাসিত ভারতে মুসলিমদের মাঝে ব্যাপকভাবে চর্চিত ও অনুসৃত।

আরো বুঝতে হবে মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহি)-এর দাওয়াত ও নেতৃত্বে মুসলিম লীগের তাকলিদের পেছনে ক্রিয়াশীল চিন্তাধারা। যে চিন্তাধারা দ্বারা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সিংহভাগ উলামায়ে কেরাম এবং তাদের কোটি কোটি অনুসারী আজও প্রভাবিত। কেবল তখনই উপলব্ধি সম্ভব হবে যে, 'আলীগড়ি সেক্যুলার' মানস এবং উলামায়ে কেরামের 'আধুনিক ইজতিহাদ' একই সুতোয় গাথা!

ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ওপর সামরিক-রাজনৈতিক ময়দানে প্রবল হওয়া ব্রিটিশরা, মুসলিমদের চিন্তার ময়দানেও প্রবল হয়ে যায়... হয়তো অজান্তেই, অগোচরেই!! যার দরুণ, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিকভাবে পরাজয় মেনে নেয়া 'আলিগড়ী সেক্যুলার'নেতৃত্ব ও 'দেওবন্দি ইসলামি' উলামাদের সম্মিলিত জোট ব্রিটিশপূর্ব ইসলামি সাম্রাজ্যের পরিবর্তে, আধুনিক পশ্চিমা ধাঁচের জাতিরাষ্ট্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন।

ভারতীয় তথা মুসলিমদের ঐক্য ও আনুগত্যের কেন্দ্রে 'ইসলামি শরীয়াহর স্থান দখল করে নেয় ইউরোপিয়ান 'জাতিরাষ্ট্র'। ফলত, শরীয়াহ শাসন নিশ্চিতের পরিবর্তে রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়াকেই সাব্যস্ত করা হয় মূল লক্ষ্য।

ফলস্বরূপ ব্রিটিশ ভারত থেকে জন্ম নেয় দুটি সেক্যুলার রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। শাসক ও আমলার গায়ের রঙ পরিবর্তন ছাড়া পাল্টালো আসলে না কিছুই!

১৯২০'এর দিকে গান্ধীর সাথে মিলে খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে উপমহাদেশে উলামায়ে কেরামের সেক্যুলার রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়। এবং এক পর্যায়ে তা পশ্চিমা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রূপ নেয়। যা কি না হাজার বছরের ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তা, তেহরিক ও রাজনীতির সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ধারার সূচনা করে।

আর তুলনামূলক ক্ষুদ্র অংশটিতে মাওলানা থানভী ও মুফতি শফিদের (রহ.) স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সক্রিয় মেহনতের মাধ্যমে জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের অধীনে পাকিস্তান নামক সেক্যুলারিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করে!

সত্তর বছর পর, পশ্চিমা সভ্যতা আজ পতনের মুখে। উপমহাদেশের সীমান্তঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ইসলামি ইমারাহ। এখন যদি উপস্থিত সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সময়কে বিপরীতে প্রবাহিত করতে হয়, যদি ইসলামকে উপমহাদেশে আবারো ফিরিয়ে আনতে হয়, তবে জানতে হবে কিভাবে সম্মান অপদস্থতায়, জ্ঞান মূর্খতায়, আমানতদারিতা (জেনে/না জেনে) খিয়ানতে রূপ নিয়েছিল।

???????? ??????? (??.)

১৯২০'এর দিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে উপমহাদেশে উলামায়ে কেরামের সেক্যুলার রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্তির সূচনা হয়। যা দীর্ঘ ৬০০ বছরের ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তা ও রাজনীতির সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ধারার সূচনা করে।

চরম ধূর্ত, লম্পট ও কপট নেতা মোহনদাস গান্ধীর সুচতুর কৌশল ও কথার মারঁপ্যাচে বিভ্রান্ত হয়ে, উলামায়ে কেরামের বড় একটি অংশ হিন্দুদের নেতৃত্ব মেনেই অখন্ড ভারতের মেহনতে শামিল হন। কংগ্রেসের অধীনে মুসলিমদের একাত্ম করতে গঠন করা হয় 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ'। এই সময়ে ব্রিটিশবিরোধী জিহাদি আন্দোলনের অগ্রসেনানী শায়খুল হিন্দ (রহ.), মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) সহ নির্বাসন-ফেরত নেতাদের জন্য কংগ্রেস মুম্বাইতে সংবর্ধনারও আয়োজন করে।

গান্ধী-নেহরুরা মাদানী (রহ.)-কে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, হিন্দুদের সাথে সম্প্রীতি ও ঐক্যের সম্পর্কের মাধ্যমে মুসলিমরা অধিকতর ধর্মীয় নিরাপত্তা লাভ করবে। ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে একই প্লাটফর্মে আন্দোলনকে মাদানী (রহ.) অপরিহার্য মনে করতেন।

তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন—

> 'হিন্দুস্থানের স্বাধীনতার জন্যে অমুসলিমদের সাথে জোটবদ্ধ হওয়া শুধু জায়েয বললে চলবে বা বরং জরুরী হয়ে পড়েছে।'[1]

১৯২০ সালে শাইখুল হিন্দ (রহ.) মৃত্যুবরণ করার পর দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান নিযুক্ত হন মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)। ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এই শিক্ষাপীঠটির ভূমিকা অনন্য হিসেবে স্বীকৃত ছিল। মাওলানা মাদানী (রহ.)-

এর নেতৃত্বে মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র নির্বিশেষে হিন্দুদের নেতৃত্বে অখন্ড ভারত কায়েমের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করতে কোমর বেঁধে নামে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে মস্তিষ্ক থেকে ছুঁড়ে ফেলে মুসলিমদের অস্তিত্ব রক্ষা প্রকল্প সর্বপ্রথম উলামায়ে কেরামদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার প্রসার ও প্রমাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)।

তিনি লিখেন,

> ‘একদিকে আল্লাহর দুশমনদের শাসন, অপরদিকে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা, যা মুসলিমদের বেষ্টন করে রেখেছে। ফারাকটাও আবার মামুলি না। অমুসলিম পচাত্তর শতাংশ আর মুসলিমরা হল পঁচিশ শতাংশ। এই প্রকাশ্য ও ভেতরগত পার্থক্য ছাড়াও তাদের তথা অমুসলিমদের কামনা-বাসনা, আর শাসকগোষ্ঠীর ডিভাইড এন্ড রুলনীতি যে বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ তৈরী করে রেখেছে যে—আল্লাহর পানাহ্—এর উপর দারিদ্র্য, অভাব, ক্ষুধা, অস্ত্রহীনতা ইত্যাদি মুসলমানদেরকে একেবারে অসহায় করে রেখেছে। তা সত্ত্বেও উলামায়ে কেরাম নিকট-অতীতে সশস্ত্রভাবে সফলতার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যর্থতা ছাড়া আর কী ফলাফল আসলো?
>
> হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ, মাওলানা ইসমাইল শহীদরা কি চেষ্টা করেননি? ১৮৫৭ তে হযরত হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, মাওলানা কাসিম নানুতুবি, মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গুহী কী করা বাকী রেখেছিলেন? কিন্তু ইতিবাচক ফলাফল আসলো না। ১৯১৪ সালে হযরত শাইখুল হিন্দ কী করেননি, কিন্তু ঘটানাটা কী ঘটল?
>
> মুহতারাম, রাজনীতি শুধু দর্শন দিয়ে হয় না, বরং ইতিহাসও লাগে সাথে। বাধ্যবাধকতা এই ‘আহওয়ানুল বালিয়্যাতাইন’ (দু বিপদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজটা অবলম্বন করা) এর দিকে টেনে নিয়ে আসে এবং নিয়ে এসেছেও বটে। ইসলামেও অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে হুকুম ও বিধান বদলে যায়। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি থেকে চোখ বন্ধ করে থাকা ধ্বংস ও আত্মহত্যার শামিল।’

মাওলানা মাদানী ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের রাষ্ট্রচিন্তা এটাই ছিল যে, ব্রিটিশরাজের তুলনায় হিন্দু নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের অধীনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করা যাবে বেশি। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের পর ইসলামি হুকুমাত পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব, এমনটা তারা মনে করতেন না। মুসলিম সমাজের অবস্থার উন্নতি, ক্ষেত্রবিশেষে কিছু ধর্মীয় সংস্কার ইত্যাদির বাইরে কোন কিছুই অর্জনের পরিকল্পনা পরিলক্ষিত হয় না।

কংগ্রেসের জাতীয় ঐক্যের প্রস্তাবনা অনুযায়ী, হিন্দু-মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যাপারে বৈধতা আদায়ে শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) বলেন,

> ‘এখন সময় এসেছে, বড় দুশমন (ইংরেজদের) থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করা। এদেরকে পরাজিত করার জন্যে হিন্দুদের সহযোগিতা নেয়াও দরকার। ইংরেজদের মধ্যে ছুত অস্পৃশ্যতার বাতিক না থাকলেও ওরা আমাদের জঘন্য শত্রু। পক্ষান্তরে হিন্দুরা আমাদের প্রতিবেশী। কাফের হলেও হিন্দুরা প্রতিবেশীর হক রাখে।’[2]

১৯২০’এর দশকে গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলনে মুসলিমদের সম্পৃক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মাদানী (রহ.) ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। মুসলিমদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে উপমহাদেশের স্বাধীনতাকামীদের প্রধান কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে কংগ্রেস। পর্যায়ক্রমে হিন্দু-মুসলমান সকলেই কংগ্রেসকে স্বাধীনতা অর্জনের একক প্লাটফর্ম মনে করতে থাকে।

??????? ??????? ????????

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন সংশোধন করে বৃটেনের ভারত বিষয়ক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্টেগু ও গভর্নর জেনারেল চেমসফোর্ড। এই আইনের অধীনে ব্রিটিশ শাসন একটি ফেডারেল শাসন ব্যবস্থায় পরিণত হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় থাকবে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলদের হাতে এবং বিভিন্ন প্রদেশে (যেমন বাংলা, পাঞ্জাব, ইউপি, সীমান্ত প্রদেশ ইত্যাদি) শাসনকর্তৃত্ব বন্টন করা হবে নির্বাচিত প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীদের হাতে। এই সকল প্রদেশের প্রধানদের হাতে প্রদেশের প্রশাসনিক কিছু বিষয়ের ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয়। এই নির্বাচনে মুসলিম প্রার্থীদের কেবল মুসলিমরাই ভোট দিতে পারবে এবং হিন্দু প্রার্থীদের কেবল হিন্দুরাই ভোট দিতে পারবে বলেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্বাভাবিকভাবেই, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে হিন্দুত্ববাদী শক্তির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস বিজয় লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের দাওয়াতি-সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক তৎপরতার ফলে ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করে এবং অধিকাংশ প্রদেশের প্রদেশ সরকার গঠনের সমর্থ হয়।

কংগ্রেস তথা হিন্দুদের অধীনে অখন্ড ভারতে মুসলিমরা আসলে কতটুকু নিরাপদে থাকতে পারবে, তার কিছুটা নমুনা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। ১৯৩৭ সালে সীমিত পরিসরে ক্ষমতা চর্চার সুযোগকেই নীপিড়নের হাতিয়ার বানানো হয় ব্যাপকভাবে। পদে পদে বঞ্চিত মুসলিমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়। যদিও মুসলিম সেক্যুলার নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি উলামায়ে কেরামের অন্তর্গত নেতৃবৃন্দকে তোষামোদ ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের শঠতা অবলম্বন করতে নেহেরুর কংগ্রেস ভুল করেনি।

মুসলিমদের ব্যাপারে কংগ্রেসের মূল্যায়নের প্রকৃতি বাস্তবতা ফুটে উঠেছে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে। ১৯২৬ সালে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে দেওয়া বক্তৃতায় তিনি বলেছেন,

> 'হিন্দুস্তান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে—এ দেশে চিত্ত তাহার নাই।... জগতে অনেক বস্তু আছে যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান মিলনও সেই জাতীয় বস্তু।'

এতদসত্ত্বেও, জমিয়ত এবং তার শীর্ষ নেতৃত্ব হিন্দুত্ববাদীদের অধীনে স্বল্প পরিসরে কিছু সুযোগ-সুবিধা ও নামেমাত্র ধর্মীয় স্বাধীনতার আশাতেই শেষ পর্যন্ত অখন্ড ভারতের আন্দোলনে সামিল ছিলেন। এবং এখনো উনাদের উত্তরসূরিরা ভারতে প্রায় একই কর্মসূচিতে আবদ্ধ রয়েছেন।

মাদানী (রহ.) ও জমিয়তের গৃহীত পদ্ধতি ও মানহাজের মূল্যায়নে আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর বিশ্লেষণ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।

থানভী (রহ.) দেখতে পেলেন, হিন্দুদের আস্থা অর্জনের নিমিত্তে মুসলিমদের গরু কুরবানী থেকে বিরত থাকতে জমিয়তের শীর্ষ নেতৃত্ব ফতোয়া প্রদান করছেন। তখন তিনি বলেন,

> 'আমাদের কর্মকৌশলতা তো এমন হওয়া উচিৎ যে, শরীয়তের কোন বরখেলাফের স্বপক্ষে যদি সারা দুনিয়ার সম্পদও বিছিয়ে দেয়া হয় তবে সম্পদের দিকে না তাকিয়ে শরীয়তের নির্দেশ পালনে অটল থাকা। সম্পদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা।'

লাখ লাখ মুসলমান কুরবানীর যে সংস্কৃতি আত্মত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সামান্য রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে যদি ইসলামের এই মৌল প্রতীককে পরিহার করা হয় তাহলে ইসলামের ভিত্তিমূলে আঘাত হানা হবে। এমনটি করলে অমুসলিমদের কাছে একথাই প্রমাণিত হবে যে, ইসলামের সব বিধিবিধানই এমন যে, কোনো না কোনো প্রেক্ষিতে তা ত্যাগ করা যায়।'

‘অসহযোগ’ও ‘সত্যাগ্রহ’ আন্দোলন এবং পরবর্তী বিভিন্ন কর্মসূচিতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের শীর্ষ নেতৃত্বের কংগ্রেস নেতা গান্ধীর অনুগমনের তীব্র সমালোচনা করে থানভী (রহ.) বলেন,

> ‘গান্ধী দুনিয়ার দাওয়াত দেয়; তাই যারা দুনিয়া-পূজারী তারাই তার দাওয়াতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।’
>
> ‘গান্ধীর প্রতিটি কাজ ও কথায় একটি সুক্ষ্ম চাল থাকতো। সে ইংরেজ ও মুসলমানদের সব সময় নির্বোধ বানাতে চাইতো, ধোঁকায় ফেলতে চাইতো। তার লক্ষ্য ছিল ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে সবসময় সংঘর্ষ বাধিয়ে রাখা। এ কাজে সে ছিল খুবই পটু।’

ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে অপরিহার্য মনে করা এবং সেদিকে আপামর মুসলিম সাধারণকে আহবানের অসারতা আলোচনা করতে থানভী (রহ.) বলেন,

> ‘যৌক্তিক দৃষ্টিতে দেখলে তাতে মনে হয় এমতাবস্থায় ঐক্য স্থাপন সম্ভব কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দেখতে হবে এ ধরনের ঐক্যে কারা লাভবান হয় আর ক্ষতি কাদের হয়। এ মুহূর্তেও যদি হিন্দু ও মুসলমানদের হাতে শাসন ক্ষমতা এসে যায়, তৃতীয় পক্ষের কোন দখল না থাকে তাহলেও হিন্দুরাই লাভবান হবে। সাফল্য মুসলমানদের করায়ত্ত হবে না। এ কথা যুক্তির নিরিখে বলা চলে।
>
> ওদের সংখ্যাধিক্যও এর একটি কারণ এবং ওদের স্বভাবই এমন যে ওদের সংস্পর্শে মুসলমানরা লাভবান হতে পারবে না। পক্ষান্তরে বিবেক ও বুদ্ধি একথা বলে যে, যদি ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সবাই সমান লাভবান হবে কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কখনও ন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে না। অতীত এর জলন্ত সাক্ষী হিন্দুরা ভারতকে মুসলিম মুক্ত করতে সবসময়ই তৎপর। এরা ওদের স্বভাব থেকে কখনই বিরত থাকবে না। এদের কাজই হলো খুনাখুনী আর সুযোগ পেলেই মুসলিম নিধনে মেতে উঠা।’[3]

কংগ্রেসে যোগদানের ক্ষেত্রে মাদানী (রহ.)-এর অবস্থানকে নাকচ করে দিয়ে থানভী (রহ.) বলেন,

> ‘কোনো মুসলমানের উচিত নয় কংগ্রেসে যোগ দেওয়া।’[4]

১৯৩৯ সালে দিল্লিতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর কেন্দ্রীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে থানভী (রহ.)-কেও দাওয়াত করা হয়। মাওলানা সেই বৈঠকে উপস্থিত না হওয়ার ব্যাপারে দাওয়াতনামার অপর পিঠে যা লিখেছেন, কংগ্রেস সম্পর্কে এটাই তার মূল্যায়নের সারবস্তু। তিনি সেখানে কংগ্রেস সম্পর্কে তার তীব্র বিরোধিতার বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন। তিনি লিখেন,

> ‘বর্তমান পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী আমাকে এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে বাধ্য করেছে যে, এ মুহূর্তে উলামাদের কংগ্রেসে যুক্ত থাকা ধর্মের দিক থেকে খুবই ধ্বংসাত্মক। এর চেয়ে বরং কংগ্রেস থেকে বের হয়ে আসার ঘোষণা করা খুব জরুরী হয়ে পড়েছে। উলামাদের উচিৎ কোন মুসলিম সংগঠনে যোগ দেয়া। মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করা বা কাউকে যোগদানে উৎসাহিত করা আমার দৃষ্টিতে ধর্মীয়ভাবে অপমৃত্যুর শামিল।’

এই বিষয়টি বাস্তব যে, মুসলমানরা কংগ্রেসের যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত তা ছিল একটি জনবিচ্ছিন্ন সংগঠন। মাওলানা থানভী (রাহিঃ) বহুবার তার মজলিসে নিজের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,

> ‘মুসলমানদের অংশগ্রহণই ছিল জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা হওয়ার প্রধান হাতিয়ার। হিন্দুদের দ্বারা গঠিত পঞ্চাশ বছরের কংগ্রেসকে মুসলমানরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে জীবিত করে ফেলেছিল।’

নেহরু-গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের সাথে মুসলিমদের সাময়িক সময়ের ঐক্যও যে ভয়াবহ তা উল্লেখ করে বলেন,

> ‘মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দেয়ার অর্থ ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস টেনে আনা। মুসলমানদের কংগ্রেস

> করা, হিন্দুদের সাথে মিলেমিশে কাজ করা কিংবা হিন্দুদেরকে মুসলমানদের সাথে মিশানো জাতি ও ধর্ম উভয়টির জন্যে ভয়ংকর ক্ষতির কারণ হবে।'

মাওলানা মাদানি (রহ.)-সহ জমিয়তের অন্যান্য উলামায়ে কেরামের রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিচ্যুতির ব্যাপারে মাওলানা থানভীর উপলব্ধি ছিল—

> 'হিন্দু ও কংগ্রেসীরা ইংরেজদের হিন্দুস্থান থেকে বিতাড়নে আন্তরিক নয়। ওদের লক্ষ্য হলো ইংরেজদের সাথে দরকষাকষি করে নিজেদের জাতি ও ধর্মের বিজয়ডংকা বাজানো। কারণ কংগ্রেসী হিন্দুরা ভালভাবেই জানে, ইংরেজদের থাকাই তাদের জন্যে মঙ্গলজনক; ইংরেজদের চলে যাওয়ার মধ্যে তাদের বিপদের আশংকাও রয়েছে, না হলে ইংরেজদের উপস্থিতিতে এরা এতটা খুশহালে সরকারী কাজে যোগদান করতে পারত না।'

অপর এক মজলিসে কংগ্রেসী উলামাদের সংস্পর্শে তিনি বলেন,

> 'তারা একথা বুঝতেই চান না যে, হিন্দুরা হিন্দুস্থান থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে চায় না। তারা চায় ইংরেজদের উপস্থিতিতে তাদের ধর্ম ও জাতীয়তার ভিত মজবুত করতে।'

ভারতবর্ষে হিন্দুত্ববাদী শক্তি কংগ্রেসের ব্যাপারে খ্যাতিমান নেতা ডঃ আম্বেদকরও এই রূঢ় বাস্তবতাকে স্বীকার করে লিখেছেন,

> 'কংগ্রেস শক্তিশালী ও ব্যাপকতা হিন্দুদের দ্বারা পায়নি বরং তা মুসলিমদের অংশগ্রহণেই হয়েছে।'

পরিশেষে, হালের আরশাদ মাদানি, মাহমুদ মাদানি বা ফরিদউদ্দিন মাসউদদের যত সমালোচনাই করা হোক না কেন, বাস্তবতা এটাই যে—উলামায়ে দেওবন্দের একাংশের অনুসৃত অতিনমনীয় ও দ্রবীভূত মানহাজের ভিত প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন স্বয়ং মাওলানা মাদানি (রহ.) ।

???????? ?????? (??.)

হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর নেতৃত্বে মুসলিমদের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে কংগ্রেস যখন অদম্য গতিতে অগ্রসরমান, তখন অপর সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী মুসলিম লীগও একই রাস্তায় হাঁটার সিদ্ধান্ত নেয়। আগাগোড়া সেক্যুলার ও পশ্চিমাপন্থী জিন্নাহ ও অন্যান্যরা মুসলিম লীগের সাথে দেওবন্দী উলামাদের বিশাল একটি অংশকে নিজেদের কর্মসূচির অধীনস্থ করে নেয়। আর এই অংশটির নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)।

হিন্দুদের অধীনস্থতা মেনে ব্রিটিশরাজের অবসানের পরিকল্পনার বিপরীতে মুসলিম লীগের অধীনে পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন মাওলানা থানভী (রহ.) ও তার অনুসারী উলামায়ে কেরাম। যাদের মাঝে ছিলেন মুফতি শফি (রহ.), মাওলানা শাব্বির আহমেদ উসমানী রহমান (রহ.) প্রমুখ।

১৯৩৭ সালে এলাহাবাদ মুসলিম লীগ কমিটির সেক্রেটারির প্রশ্নের জবাবে মাওলানা থানভী (রাহিঃ) বলেন,

> 'আমার মতে প্রত্যেক ভারতীয় মুসলমানের মুসলিম লীগে যোগদান করা উচিত।'[5]

ইংরেজদের ভাবশিষ্য নবাব ইসমাইল খানের বক্তব্যে প্রলুব্ধ হয়ে মাওলানা থানভী (রহ.) মুসলিমলীগপন্থী হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে সাইয়্যিদ হাসান রিয়াজ বলেন,

> 'মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাহিঃ) মুসলিম লীগের সভাপতিকে কতগুলো প্রশ্ন করলে; তখনকার ইউপি মুসলিম লীগের সভাপতি নওয়াব ইসমাইল খান যে জবাব দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হয়ে মাওলানা থানভী (রহ.)

তার সাথে সংশ্লিষ্ট ও পরিচিত সবাইকে মুসলিম লীগকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। এর ফলে অসংখ্য বড় বড় আলেম মুসলিম লীগের চেহারাটা পাল্টে দিয়েছিল।'

মুসলিম লীগ ও জিন্নাহর নেতৃত্বে বিশাল ভূখণ্ড হিন্দুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে হলেও পৃথক ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে মাওলানা থানভী বলেন,

> 'মুসলমানদের উচিত মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করতে সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টার ত্রুটি না করা। কেননা হিন্দুস্থানে মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিশ্চিত করতে পারে একমাত্র মুসলিম লীগ।'

এক পর্যায়ে এসে মাওলানা থানভী প্রকাশ্যেই মুসলিম লীগের সহযোগিতা করতে শুরু করেন এবং নিজেই থানাভবন এলাকায় মুসলিম লীগের শাখা গঠনের নির্দেশ দিয়ে, মুসলিম লীগ সম্পর্কে তাঁর অবস্থানকে আরো পরিষ্কার করে দেন।

তবে মাওলানা থানভী (রহ.) মুসলিম লীগের ব্যাপারে আশঙ্কাও করেছিলেন,

> 'মুসলিম লীগ বিত্তশালী জমিদারদের দল। আমি জানি না, এরা ক্ষমতায় গেলে ইসলামি আইন চালু করবে কি না। যদিও কংগ্রেসের তুলনায় মুসলিম লীগ আমার কাছে ভাল মনে হয়, কিন্তু আমি সন্দেহমুক্ত হতে পারছি না।'

কিন্তু ১৯৩৮ সালে ঝাসীর নির্বাচনী আসনে মুসলিম লীগ জয়লাভ করলে তিনি মুসলিম লীগের প্রতি অনেকটা ঝুঁকে পড়েন। ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল থানাভবনে মুসলিম লীগের বিজয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অন্তত দশ হাজারের মতো মুসলমান সে সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিল। মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী সে সমাবেশে হযরত থানভীর পক্ষ থেকে বক্তৃতা পাঠ করে শুনিয়ে ছিলেন। থানভী (রহ.) সে বক্তৃতায় সশরীরে উপস্থিত না হওয়ার কারণ উল্লেখ করে লিখিত বক্তব্যে বলেন,

> 'আমি সশরীরে সমাবেশে উপস্থিত থাকতে না পারলেও আপনাদের সাথে আছি, এবং মুসলিম লীগের সৎ ও ভাল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে একমত। আমি মুসলিম লীগের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে দু'আ করি। তিনি উপস্থিত মুসলমানদের উদ্দেশে। বলেন, সকল মুসলমানের উচিৎ নিজেদের সাধ্যমত মুসলিম লীগের উন্নতি এবং শারঈ দুর্বলতাগুলো সংশোধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা।'

পরবর্তীতে পাটনা সম্মেলনে মুসলিম লীগ নেতৃত্বকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখেন মাওলানা থানভী (রহ.)। তবে এই চিন্তা আশ্চর্যজনকভাবে কারো মাথায় এলো না যে, যারা নামাজই আদায় করে না, তারা কিভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে!!

মাওলানা থানভী রাজনৈতিকভাবে ভারত স্বাধীনের ক্ষেত্রে জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের চিন্তার একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন।

জিন্নাহর প্রতি মাওলানা থানভী (রহ.)'র শ্রদ্ধাবোধ ও আস্থার প্রমাণ হিসেবে নিচের লেখাটি দেখা যেতে পারে—

> 'স্বপ্ন আমি খুব কম দেখি, কিন্তু যখন দেখি তা বহুলাংশেই বাস্তবে প্রতিফলিত হয়। একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, ময়দানে হাশর অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে কিছুসংখ্যক লোক আসনে উপবিষ্ট। তাদের সবাই উলামা ও সুলাহা।
>
> কিন্তু আমি দেখতে পেলাম মিস্টার জিন্নাহও একটি আবা' পরিহিত অবস্থায় তাদের পাশেই একটি কুরসীতে উপবিষ্ট। আমার মনে প্রশ্ন হলো, মিস্টার জিন্নাহ এই পর্যায়ে কি ভাবে এলেন?
>
> সাথে সাথেই এক বুযুর্গ আমাকে বললেন, মিস্টার জিন্নাহ বর্তমানে ইসলাম ও মুসলমানদের খুব সেবা করছেন,

এজন্য তাকে এ সম্মান দেয়া হয়েছে।।’[6]

[illegible]

পৃথক ইসলামি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়ে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও তার সেক্যুলার সহচরবৃন্দ মাওলানা থানভী (রহ.), মাওলানা শফি (রহ.)’দের প্রবঞ্চিত করতে সক্ষম হলেও, এক্ষেত্রে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) ঠিকই তা বুঝতে পেরেছিলেন।

যে উদ্দেশ্যে মাওলানা থানভী (রাহিঃ) এবং উনার গুণগ্রাহী উলামায়ে কেরাম মুসলিম লীগ ও জিন্নাহকে শক্তিশালী করেছিলেন তা রদ করে তিনি বলেন,

> “বর্তমানে পাকিস্তান আন্দোলন খুবই রমরমা। ‘পাকিস্তান’-এর অর্থ যদি হয়, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলায় ইসলামের বিধান ও রাসুলের তরিকা মোতাবেক—হুদুদ, কিসাস এবং অন্যান্য ইসলামি আইনের ভিত্তিতে—একটা ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন, তাহলে এটা খুবই মহান কাজ, এর ব্যাপারে মুসলমানদের কোন অভিযোগ থাকা উচিত না। কিন্তু সত্য এই যে, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে, এইরকম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা চিন্তাও করা যায় না।”

‘মাদানী ও মওদূদী: উপমহাদেশের দুই মনীষী কেন পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন?’ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংশ্লেষ পাওয়া যায়—

> ‘মাওলানা মাদানি একথা বুঝতে পেরেছিলেন, পাকিস্তান ‘ইসলামি রাষ্ট্র’ বলতে যা বোঝায় তার কিছুই হবে না। পাকিস্তান একটা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সেক্যুলার রাষ্ট্র হবে।
>
> মাওলানা মাদানি জিন্নাহর নানা মন্তব্য (‘পাকিস্তান হবে ওয়েস্টার্ন ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি/ শিল্প কারখানা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতই সরকারের হাতে থাকবে’) কোট করে, তার ব্যক্তিগত জীবন ও অনুসৃত বহু নীতি কোট করে ‘ইসলাম প্রতিষ্ঠা’র ব্যাপারে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। ‘ইসলামি শরীয়াহ’ প্রতিষ্ঠার কোন ইচ্ছা জিন্নাহর ছিল না, তার আধুনিক চিন্তাধারা এই ‘শরীয়াহ’ পালনও করত না।
>
> তাহলে পাকিস্তান কী ছিল? পাকিস্তান ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বার্থরক্ষা ও বাংলার অত্যাচারিত মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিচয়ধারীদের গোত্রীয় মুক্তির আন্দোলন। এর সাথে ধর্মের সম্পর্ক ছিল কেবল পরিচয়ের খাতিরেই, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্যে না। মুসলমানদের রাষ্ট্র জিন্নাহর কাম্য ছিল, ইসলামি রাষ্ট্র না৷
>
> জিন্নাহর নানান দাবিদাওয়া নিয়ে দর কষাকষি করার একটা টোকেন ছিল পাকিস্তান। জিন্নাহর এমন জাতিবাদে মাদানির সায় ছিল না। তিনি ধরতে পেরেছিলেন, আর যা ই হোক, শরীয়াহ বা ইসলামি রাষ্ট্র জিন্নাহর লক্ষ্য না। তাই মুসলিম লীগের ‘ইসলামি’ রাষ্ট্রের ধারণার তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। এবং জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ মুসলিম লীগের ‘ইসলামবিরোধী’ কর্মকাণ্ডের একটা তালিকা হ্যাঁণ্ডবিল আকারে প্রচার করছিলো, যেগুলা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রাষ্ট্র ও ক্ষমতার সাথে ইসলাম-প্রশ্নের মীমাংসা করা মুসলিম লীগের লক্ষ্য ছিল না, তাদের লক্ষ্য ছিল একটা মুসলিম মেজরিটি রাষ্ট্র গঠন।’

মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) স্বীয় দূরদৃষ্টি দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন হিন্দু নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস এবং সেক্যুলার মুসলিম লীগ আদতে ভিন্ন কিছু নয়। উভয় দলই মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাসস্থান আর রুটি-রুজির বাইরে কোনো কিছুর সমাধান চায় না। উভয় পক্ষই চায় ধর্মনিরপেক্ষতা ও ব্রিটিশ আদলে গড়ে ওঠা শাসনক্ষমতার দখল। এজন্য প্রয়োজন কেবল মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমর্থন বা নিষ্ক্রিয়তা। অর্থাৎ, মাওলানা থানভি যেমন সুচারুভাবে মাওলানা মাদানির ভুলগুলো ধরতে পেরেছিলেন, একইভাবে মাওলানা মাদানিও মাওলানা থানভির চিন্তাধারার বিচ্যুতি সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আফসোস শুধু এখানেই যে মাওলানা মাদানী (রহ.) ও মাওলানা থানভী (রহ.) পরস্পরের রাজনৈতিক চিন্তার দৈন্যদশার সঠিক পর্যালোচনায় উপনীত হলেও নিজেদের ক্ষেত্রে তা তলিয়ে দেখেননি। যার ফলে এখন অবধি মাওলানা থানভির চিন্তাধারা আঁকড়ে আছেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অসংখ্য দেওবন্দি উলামায়ে কেরাম ও রাজনৈতিক দল।

????????

উনবিংশ শতকের শেষভাগে শুরু হওয়া সেক্যুলারিজমের মোড়কে হাজির হওয়া বিকৃত 'ইসলামপন্থা 'যে বাতিলপন্থীদের পাশাপাশি সরলমনা উলামায়ে কেরামদের মনকেও গ্রাস করে নিয়েছিল তার ঐতিহাসিক বাস্তবতা কিছুটা আলোচনা করা হল।

দাওয়াহ, ইদাদ ও বিপ্লবের নববি মানহাজ বাদ দিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে 'ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন' ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানদের পক্ষে আসেনি মোটেও।

যে রক্তপাত এড়ানোর জন্য মাদানী (রহ.) এর নেতৃত্বে অস্ত্র আর জিহাদ ছেড়ে মুসলমানরা কংগ্রেস অনুগামী হয়েছিল, তা এড়ানো যায়নি। হিন্দুরা কথা রাখেনি। মাদানী (রহ.)-এর চিন্তাধারাকে ভুল প্রমাণিত করে একের পর এক দাঙ্গায় পাইকারি হারে হিন্দুরা মুসলিমদের হত্যা করেছে। নিকট অতীত ও বর্তমাননেও কাশ্মীর, গুজরাট, ইউপি আর আসামে মাদানী (রহ.)-এর 'প্রতিবেশী' হিন্দুরা মুসলিম হত্যা ও নির্যাতনের ব্রিটিশদের অতিক্রম করেছে বহু আগেই।

যে রক্তপাত এড়ানোর জন্য মাওলানা থানভী (রহ.), মাওলানা শফী (রহ.)-দের আহবানে শত শত বছর ইসলামের অধীনে থাকা সুবিশাল ভূখন্ড হিন্দুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মুসলমানরা পাকিস্তান গঠন করেছিল, তা এড়ানো যায়নি। শুধুমাত্র স্থানান্তরের পথেই প্রাণ দিতে হয় ১০ লাখ মুসলমানের। স্থানান্তরিত হয় কোটির কাছাকাছি। ধর্ষিত হয় লক্ষাধিক নারী। এছাড়াও সম্মান বাঁচাতে কুয়ায় লাফিয়ে পড়ে অজস্র মুসলিম মা-বোন। আপন কথা রাখেনি জিন্নাহ বা মুসলিম লীগ। পাকিস্তানে একমুহূর্তের জন্যও শরীয়াহ প্রয়োগ হয়নি। শরীয়াহ শাসন আজো সুদূরপরাহত।

এছাড়া মোটা দাগে একটি ভুল চিন্তা উভয়েই করেছেন। আর তা হলো—মাত্র দুইবারের ব্যর্থতাই উনাদের ইংরেজদের বেঁধে দেয়া ছকে ইসলামি আন্দোলনের অদ্ভুত এক 'ইজতিহাদ' করতে বাধ্য করেছে!

১৮৫৭ ও ১৯১৪ তে মাত্র দুইবার পিছিয়ে পড়েই তাড়াহুড়ো করে হাজী ইমদাদুল্লাহ'র মানহাজ পরিত্যাগ করে, সেক্যুলার রাজনীতি চর্চার অদূরদর্শী ও স্থূল চিন্তাধারার ফলাফল আমরা আজ সচক্ষে দেখছি। ইংরেজ আমলের চেয়েও আজ উপমহাদেশের মুসলিমদের দ্বীনি, দুনিয়াবী স্বাধীনতা বহুগুণ কম!

অথচ, ইসলামি আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াত দুটিকে সামনে রাখা উচিৎ ছিলঃ-

فَاصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الۡعَزۡمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسۡتَعۡجِلۡ لَّهُمۡ ؕ

> 'অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর আপনি তাদের জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না।' (সূরা আল-আহকাফ, ৪৬:৩৫)

فَاصۡبِرۡ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لَا یَسۡتَخِفَّنَّكَ الَّذِیۡنَ لَا یُوۡقِنُوۡنَ

> 'অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।' (সূরা আর-রুম, ৩০:৬০)

আল্লামা সা'দী রহিমাহুল্লাহ আয়াতের তাফসিরে বলেন,

> 'সুতরাং আপনাকে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আল্লাহর পথে দাওয়াতেও

> লেগে থাকুন, তাদের কাছ থেকে বিমুখ হওয়া দেখলেও তা যেন আপনাকে আপনার কাজ থেকে বিমুখ না করে। আর বিশ্বাস করুন যে, আল্লাহর ওয়াদা হক। এতে কোন সন্দেহ নেই।
>
> এটা বিশ্বাস থাকলে আপনার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হবে। কারণ, বান্দা যখন জানতে পারে যে, তার কাজ নষ্ট হচ্ছে না, বরং সে সেটাকে পূর্ণমাত্রায় পাবে, তখন এ পথে যত কষ্টের মুখোমুখিই সে হোক না কেন, সে সেটাকে ভ্রক্ষেপ করবে না, কঠিন কাজও তার জন্য সহজ হয়ে যায়, বেশী কাজও তার কাছে অল্প মনে হয়, আর তার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়ে যায়।
>
> কারণ, তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে, তাদের দৃঢ়তা কমে গেছে, তাই তাদের বিবেক হাল্কা হয়ে গেছে, তাদের সবর কমে গেছে। সুতরাং আপনি তাদের থেকে সাবধান থাকুন। আপনি যদি তাদের থেকে সাবধান না থাকুন, তবে তারা আপনাকে বিচলিত করে দিতে পারে, আপনাকে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের উপর থেকে সরিয়ে দিতে পারে। কারণ, সাধারণত মন চায় তাদের মত হতে।
>
> আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক মুমিনই দৃঢ়বিশ্বাসী, স্থির বিবেকসম্পন্ন, তাই তার জন্য ধৈর্য ধারণ করা সহজ। পক্ষান্তরে প্রত্যেক দুর্বল ঈমানদার অস্থিরমতি থাকে।’

সাময়িক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েই পূর্বসূরীদের মানহাজ ত্যাগ করে, শত্রুর বেধে দেয়া নিয়মে শত্রুর মোকাবিলার বাস্তবতা ও শরীয়াহবিরোধী মানহাজ উপমহাদেশের ইসলামি আন্দোলন ও মুসলিমদের জন্য এক কলংকজনক অধ্যায়ই হয়ে রয়েছে বটে। কেননা, পরবর্তীতে গুণমুগ্ধ মুরিদান ও মুকাল্লিদগণ এই ভুল মানহাজকেই আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন।

অথচ, তখনো সুভাষচন্দ্র বোস, সূর্য সেন, মানবেন্দ্রনাথ রায় বা মুজাফফর আহমদরা পর্যন্ত নিজ কর্মসূচী ত্যাগ করেনি। তারা ইংরেজদের নিমকখোর, প্রতিবিপ্লবী, সাম্রাজ্যবাদের দালাল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ব্যাপারে সতর্ক দূরত্ব বজায় রেখেছে। সেখানে মুসলিমদের নেতা ও উলামারা পড়ি কি মরি করে মাসালিহে মুরসালাহর মোড়কে ইংরেজদের তাবেদার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের লেজুড়বৃত্তিতে শামিল হয়েছিলেন! যে ধারা আজো বিদ্যমান নানা রূপে, আরো ব্যাপকভাবে!!

আফসোসের বিষয়, মাওলানা মাদানী (রহ.) ও মাওলানা থানভী (রহ.)’র ‘শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক ইসলামি রাজনীতি’ শরীয়াহ, বাস্তবতা ও ইতিহাসের মানদন্ডে চরম ব্যর্থ, অদূরদর্শী ও নিস্ফল প্রমাণিত হলেও; আজও অসংখ্য উলামায়ে কেরাম, তালিবে ইলম ও সাধারণ মুসলমান পূর্ববর্তীদের ভুলগুলো আঁকড়ে ধরে আছেন।

অথচ, উম্মতের উচিৎ ছিল উনাদেরকে সম্মানের স্থানে রেখেই ভুলগুলো এড়িয়ে যাওয়া। অন্ধ তাকলিদকে আঁকড়ে ধরার মানহাজ মাওলানা থানবি (রহ.) বা মাওলানা মাদানি (রহ.) অনুসরণ করতেন না। বরং, উনারা ‘সম্মান সম্মানের জায়গায়, আর হক হকের জায়গায় ‘নীতির অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মূর্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

হযরত থানভী মাওলানা মাদানী সম্পর্কে বলেন,

> ‘মাওলানা হুসাইন আহমদকে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নির্ভেজাল ও বিশ্বস্ত মনে করি। দালিলিক কারণে আমি তার রাজনৈতিক চিন্তার বিরোধী। কিন্তু এই বাধা যদি দূর হয়ে যায় তবে আমি তার একজন নগণ্য সৈনিক হিসেবে কাজ করতে প্রস্তুত।’

বাস্তবতা হলো, মাওলানা মাদানী (রহ.) ও মাওলানা থানভী (রহ.)-সহ আমাদের অধিকাংশ সরলপ্রাণ উলামায়ে কেরামের জীবনের মৌলিক অংশ পার করে দেন ইলম, তাসাওউফ ও তাদরিসের ময়দানে। যার ফলে ক্রমপরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থার (যেখানে ইসলাম ও মুসলমানরা ক্রমাগত চক্রান্তের শিকার) সঠিক ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জনে দুর্বলতা চলে আসাটা অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে আমরা উনাদের অসম্মান করা বৈধ মনে করি না। তবে ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ ও মানবজাতির কল্যাণের স্বার্থে বাধ্য হয় ভুলকে চিহ্নিত করে থাকি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিশুদ্ধ আকিদা ও নববি মানহাজের আলোকে উপমহাদেশে ইসলামি শাসন পুনঃউদ্ধারের তওফিক দান করুন। আমীন।।।

---

[1] মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম ২/১২৮, নাজিমুদ্দিন ইসলাহি

[2] মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম ১/১৪৮, নাজিমুদ্দিন ইসলাহি

[3] আল-ইফাদাতুল ইয়াউমিয়্যাহ, ৩/৩২৯-৩৩০

[4] দৈনিক ইনকিলাব, লাহোর, ০৩/১২/১৯৩৭; পৃ. ০২

[5] দৈনিক ইনকিলাব, লাহোর, ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৭, পৃষ্ঠা ২

[6] হযরত থানভীর এ উক্তি কলকাতার 'আসরে হাজের 'পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।